গল্প

পরেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরেশ

এক

মজুমদার-বংশ বড় বংশ, গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের ভারী সম্মান। বড়ভাই গুরুচরণ এই বাড়ির কর্তা; শুধু বাড়ির কেন, সমস্ত গ্রামের কর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়লোক আরও ছিল, কিন্তু এতখানি শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র শ্রীকুঞ্জপুরে আর কেহ ছিল না। জীবনে বড় চাকরি কখনো করেন নাই,—গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হইলে হয়ত তাহা দুষ্প্রাপ্য হইত না, কিন্তু প্রথম যৌবনে সেই যে একদিন অনতিদূরবর্তী জেলা-ইস্কুলের মাস্টারিতে ঢুকিয়াছিলেন, কোন লোভেই আর এই শিক্ষালয়ের মায়া কাটাইয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত হন নাই। এখানে ত্রিশ টাকা বেতন পঞ্চাশ টাকা হইয়াছিল, এবং তাহারি অর্ধেক পঁচিশ টাকা পেনশনে বছর-তিনেক হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে আজিও হয়ত টাকাটাই একমাত্র বড় পদার্থ নয়, তা না হইলে বিবাদ মিটাইতে, সালিশ নিষ্পত্তি করিতে, দলাদলির বিচার করিয়া দিতে তাঁহার আদেশই শ্রীকুঞ্জপুরের সর্বমান্য বস্তু হইয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার অপরিসীম স্বধর্ম-নিষ্ঠা, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং অবিচলিত সাধুতার সম্মুখে সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা নত করিত। বয়স ষাটের কাছাকাছি,—কেহ চরিত্র, সাধুতা বা ধর্মের বাড়াবাড়ি করিলে, দশ-বিশখানা গ্রামের লোক তামাশা করিয়া বলিত, ইস! এ যে একেবারে গুরুচরণ! গুরুচরণের স্ত্রী ছিল না, ছিল একমাত্র পুত্র বিমল। জগতে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় সত্যকার কিছু নাই, না হইলে এতবড় সর্বগুণান্বিত পিতার এতবড় সর্বদোষাশ্রিত পুত্র যে কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিল লোকে ভাবিয়া পাইত না।

পুত্রের সহিত পিতার সাংসারিক বন্ধন ছিল না বলিলেই চলে, কিন্তু তাঁহার সকল বন্ধন গিয়া পড়িয়াছিল ভ্রাতুষ্পুত্র পরেশের উপর। হরিচরণের বড় ছেলে পরেশই যেন তাঁহার আপনার ছেলে—পরেশ এম. এ. পাস করিয়া আইন পড়িতেছে—তাহাকে বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজিও সমস্ত পড়া তিনিই পড়াইয়া আসিতেছেন। বিমল যে কিছু শিখিল না, এ দুঃখ তাঁহার এক পরেশ হইতে মিটিয়াছে।

দুই

ছোটভাই হরিচরণ এতদিন বিদেশে সামান্য চাকরিই করিতেছিল, হঠাৎ লড়াইয়ের পরে কি জানি কেমন করিয়া সে বড়লোক হইয়া চাকরি ছাড়িয়া বাড়ি চলিয়া আসিল। লোককে চড়া সুদে টাকা ধার দিতে লাগিল, স্ত্রীর নামে একটা বাগান খরিদ করিয়া ফেলিল, এবং আরও দু-একটা কি-কি কাজ করিল যাহাতে তাহার টাকার গন্ধ পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোকের নাকে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না।

একদিন হরিচরণ আসিয়া সবিনয়ে কহিল, দাদা, অনেকদিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বলব ভাবচি—

গুরুচরণ কহিল, বেশ বল।

হরিচরণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আপনি একলা আর কত পারবেন, বয়সও হ'লো—

গুরুচরণ কহিল, হ'লো বৈ কি। ষাট চলচে।

হরিচরণ কহিল, তাই বলছিলাম, আমি ত এখন বাড়িতেই রইলাম, বিষয়-আশয়গুলো সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে, একটু চিহ্নিত করে নিয়ে যদি আমিই—

গুরুচরণ ক্ষণকাল ছোটভাইয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বিষয়-আশয় আমাদের সামান্যই, আর তা এলোমেলো হয়েও নেই, কিন্তু তুমি কি পৃথক হবার প্রস্তাব করচ?

হরিচরণ লজ্জায় জিভ কাটিয়া কহিল, আজ্ঞে না না, যেমন আছে যেমন চলচে তেমনই সব থাকবে, শুধু যা যা আমাদের আছে একটু অমনি চিহ্ন দিয়ে নেওয়া, আর রান্না-বান্নাটাও বড় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার—সমস্ত একই থাকবে—তবে ডালটা ভাতটা আলাদা করে নিলে, বুঝলেন না—

গুরুচরণ বলিলেন, বুঝিচি বৈ কি! বেশ, কাল থেকে তাই হবে।

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, চিহ্নটা কিভাবে দেবেন স্থির করেছেন?

গুরুচরণ কহিলেন, স্থির করার ত এতদিন আবশ্যক হয়নি, তবে আজ যদি হয়ে থাকে, আমার তিন ভাই, তিন অংশ সমান ভাগ করে নিলেই হবে।

হরিচরণ আশ্চর্য হইয়া বলিল, তিন অংশ কি-রকম? মেজবৌ বিধবা, ছেলেপুলে নেই, তাঁর আবার অংশ কি? দু'ভাগ হবে।

গুরুচরণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তিন ভাগ হবে। মেজবৌমা আমার শ্যামাচরণের বিধবা, যতদিন বেঁচে আছেন অংশ পাবেন বৈ কি।

হরিচরণ রুষ্ট হইল, কহিল, আইনে পেতে পারে না, শুধু খেতে-পরতে পেতে পারে।

গুরুচরণ কহিলেন, সে ত পারেই, কেননা বাড়ির বৌ।

হরিচরণ কহিল, ধরুন কাল যদি বিক্রি করতে কিংবা বাঁধা দিতে চায়?

গুরুচরণ বলিলেন, আইনে যদি সে অধিকার দেয়, তিনি করবেন।

হরিচরণ মুখ কালো করিয়া বলিল, হুঁ করবেন বৈ কি।

পরদিন হরিচরণ দড়ি লইয়া ফিতা লইয়া বাড়িময় মাপজোখ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, গুরুচরণ জিজ্ঞাসাও করিলেন না, বাধাও দিলেন না। দিন দুই-তিন পরে ইঁট কাঠ বালি চুন আসিয়া পড়িল; বাড়ির পুরানো ঝি আসিয়া খবর দিল, কাল থেকে রাজমিস্ত্রী লাগবে, ছোটবাবুর পাঁচিল পড়বে।

গুরুচরণ সহাস্যে কহিলেন, সে ত দেখতেই পাচ্ছি গো, বলতে হবে কেন!

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সন্ধ্যার পরে দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া গুরুচরণ মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চুর মা, কি গা?

পঞ্চুর মা বহুদিনের দাসী, সে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, মেজবৌমা দাঁড়িয়ে আছেন, বড়বাবু।

বড়বৌয়ের মৃত্যুর পর হইতে বিধবা ভ্রাতৃবধূই এ-সংসারের গৃহিণী, তিনি অন্তরাল হইতে ভাশুরের সহিত কথা কহিতেন; মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, শ্বশুরের ভিটেতে কি আমার কোন দাবী নেই যে ছোটবৌয়েরা আমাকে অহরহ গালমন্দ করচে?

গুরুচরণ কহিলেন, আছে বৈ কি বৌমা, যেমন তাঁদের আছে, ঠিক তোমারও তেমনি আছে।

পঞ্চুর মা বলিল, কিন্তু এমন ধারা করলে ত বাড়িতে আর টিকতে পারা যায় না।

গুরুচরণ সমস্ত শুনিতেছিলেন, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, পরেশকে আসতে চিঠি লিখে দিয়েচি পঞ্চুর মা, একবার সে এসে পড়লেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে,– এ ক'টা দিন তোমরা একটু সহ্য করে থাকো।

মেজবৌ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু পরেশ কি–

গুরুচরণ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু নয় মেজবৌমা, আমার পরেশের সম্বন্ধে কিন্তু চলে না। হরি তার বাপ বটে, কিন্তু সে আমারই ছেলে, সমস্ত পৃথিবী যদি একদিকে যায়, তবু সে আমারই। তার জ্যাঠামশায় যে কখনো অন্যায় করে না এ যদি সে না বোঝে ত বৃথাই এতদিন পরের ছেলেকে বুক দিয়ে মানুষ করে এলাম।

দাসী কহিল, সে আর বলতে? সে বছর মায়ের অনুগ্রহ হলে তুমি ছাড়া আর যমের মুখ থেকে তাকে কে কেড়ে আনতে পারতো বড়বাবু? তখন কোথাই বা ছোটবাবু, আর কোথাই বা তার সৎমা। ভয়ে একবার দেখতে পর্যন্ত এলো না। তখন একলা জ্যাঠামশায়, কিবা দিন কিবা রাত্রি।

মেজবৌমা বলিলেন, পরেশের নিজের মা বেঁচে থাকলেও হয়ত এতখানি করতে পারতেন না।

গুরুচরণ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, থাক মা ও-সকল আলোচনা। তাহারা প্রস্থান করিলে বৃদ্ধের চোখের সম্মুখে যেন বিমল এবং পরেশ আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইল। জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। তাহার পরে মোটা বাঁশের লাঠিটি হাতে তুলিয়া লইয়া সরকারদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন দুপুরবেলা গুরুচরণ ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন, বাটীর উত্তরদিকের বারান্দার কতকটা অংশ ঘিরিয়া লইয়া হরিচরণের রান্নার কাজ চলিতেছিল, তথা হইতে

তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে কি কটু কথাই যে বাহির হইয়া আসিতেছিল তাহার সীমা নেই। তাঁহার আহারের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিতেছিল, কিন্তু সহসা পুরুষের মোটা গলা আসিয়া যখন তাহাতে মিশিল তখন ক্ষণকালের জন্য তিনি কান খাড়া করিয়া শুনিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেজবধূঠাকুরানী অন্তরাল হইতে হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং পঞ্চুর মা ক্রোধে ক্ষোভে চিৎকার করিয়া এই দুর্ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া গুরুচরণ ডাকিয়া কহিলেন, হরিচরণ, মেয়েদের কথায় আমি কান দিতে চাইনে, কিন্তু তুমি পুরুষমানুষ হয়ে যদি বিধবা বড়ভাজকে এমনি করেই অপমান কর, তাঁর ত তা হলে বাড়িতে থাকা চলে না।

এ কথার কেহ জবাব দিল না, কিন্তু বাহিরে যাইবার পথে ছোটবধূমাতার পরিচিত তীক্ষ্ণকণ্ঠ তাঁহার কানে গেল, সে তামাশা করিয়া কহিতেছে, অমন করে অপমান ক'রো না বলচি, মেজবৌঠাকুরুন তা হলে বাড়িতেই থাকবেন না। কি হবে তখন?

হরিচরণ প্রত্যুত্তরে কহিতেছে, পৃথিবী রসাতলে যাবে আর কি! কেবা থাকবার জন্যে মাথার দিব্যি দিচ্চে—গেলেই ত বাঁচা যায়।

গুরুচরণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, বক্তব্য শেষ হইলে নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

তিন

হেডমাস্টার মশায়ের কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে গুরুচরণ কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দিন-দুই হইল পরেশ বাড়ি আসিয়াছে, কিন্তু আসিয়াই জ্বরে পড়িয়াছে। ব্যস্ত হইয়া পরেশের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, সম্মুখে ছোটভাইকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পরেশের নাকি জ্বর?

হরিচরণ ‘হুঁ’ বলিয়া বাহির হইয়া গেল। ছোট বধূমাতার বাপের বাড়ির দাসী পথ আটকাইয়া বলিল, আপনি ঘরের ভেতর যাবেন না।

যাবো না? কেন?

ঘরে মা বসে আছেন।

তাঁকে একটুখানি সরে যেতে বল না ঝি।

দাসী কহিল, সরে আবার কোথায় যাবেন, ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চেন। এই বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

গুরুচরণ আচ্ছন্নের মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন, পরেশ, কেমন আছো বাবা?

ভিতর হইতে এই ব্যাকুল প্রশ্নের কোন সাড়া আসিল না, কিন্তু ঝি কোথা হইতে জবাব দিয়া কহিল, দাদাবাবুর জ্বর হয়েচে শুনতে পেলেন ত!

গুরুচরণ স্তব্ধভাবে সেইখানে মিনিট দু-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সেখানে বিবাহ-বাড়িতে আর কেহ তেমন লক্ষ্য করিল না, কিন্তু কাজকর্ম চুকিয়া গেলে, তাঁহার বহুদিনের বন্ধু হেডমাস্টারমশাই আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি ঘটেছে গুরুচরণ? হরিচরণ নাকি ভারী তোমার পিছনে লেগেছে?

গুরুচরণ অন্যমনস্কের মত কহিলেন, হরিচরণ? কৈ না।

না কি হে? হরিচরণের শয়তানি কাণ্ড ত সবাই শুনেছে।

গুরুচরণের হঠাৎ যেন সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল, কহিলেন, হাঁ হাঁ, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে হরিচরণ গণ্ডগোল করচে বটে।

তাঁহার কথার ধরনে হেডমাস্টার ক্ষুণ্ণ হইলেন। ছেলেবেলার অকপট বন্ধু, তথাপি গুরুচরণ ভিতরের কথা ঔদাস্যের আবরণে গোপন করিতে চাহে, ইহাই মনে করিয়া তিনি আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

গুরুচরণ কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার এই কয়েকদিনের অনুপস্থিতির অবসরে উঠানের নানা স্থানে গর্ত খুঁড়িয়া হরিচরণ এমন কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছে যে পা ফেলা যায় না। বুঝিলেন যে তাহার মর্জি এবং সুবিধামত ভদ্রাসন ভাগ হইয়া প্রাচীর পড়িবে। তাহার টাকা আছে, অতএব আর কাহারও মতামতের প্রয়োজন নাই।

নিজের ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন, মেজবৌমাকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চুর মা আসিয়া দাঁড়াইল। গুরুচরণ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ, অস্ফুট আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া মেজবৌমা কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। পঞ্চুর মা নিজেও কাঁদিতে লাগিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতেই জানাইল যে, পরশু সকালে মেজবৌমাকে গলায় ধাক্কা মারিয়া হরিচরণ বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, এবং সে উপস্থিত না থাকিলে মারিয়া আধমরা করিয়া দিত।

ঘটনাটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে গুরুচরণের অনেকক্ষণ লাগিল। তাহার পরেও তিনি মাটির মূর্তির মত নির্বাক ও নিস্পন্দ থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, হরিচরণ সত্যি সত্যিই তোমার গায়ে হাত দিলে বৌমা! পারলে? খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরেশ বোধ হয় শয্যাগত?

পঞ্চুর মা কহিল, তার ত কিছুই হয়নি বড়বাবু। এই ত আজ সকালের গাড়িতে কলকাতা চলে গেল।

হয়নি? তার বাপের কীর্তি সে তবে জেনে গেছে?

পঞ্চুর মা কহিল, সমস্তই।

গুরুচরণের পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত যেন দুলিতে লাগিল। কহিলেন, বৌমা, এতবড় অপরাধের শাস্তি যদি তার না হয় ত এ বাড়ি থেকে বাস আমার উঠল। এখনো সময় আছে, আমি গাড়ি ডেকে আনচি, তোমাকে আদালতে গিয়ে নালিশ করতে হবে।

আদালতে নালিশ করার নামে মেজবৌ চমকিয়া উঠিল। গুরুচরণ বলিলেন, গৃহস্থের বৌ-ঝির পক্ষে এ কাজ সম্মানের নয় সে আমি জানি, কিন্তু এতবড় অপমান যদি মুখ বুজে সহ্য কর মা, ভগবান তোমার প্রতি নারাজ হবেন। এর চেয়ে বেশি কথা আর আমি জানিনে।

মেজবৌ ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি পিতৃতুল্য। আমাকে যা আদেশ করবেন আমি অসঙ্কোচে পালন করব।

হরিচরণের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু হইল। গুরুচরণ তাঁহার সাবেক দিনের সোনার চেন বিক্রি করিয়া বড় উকিলের মোটা ফি দাখিল করিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মামলার ডাক পড়িল। হরিচরণ হাজির হইল, কিন্তু বাদিনীর দেখা নাই। উকিল কি একটা বলিল, হাকিম মকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন। ভিড়ের মধ্যে গুরুচরণের হঠাৎ চোখ পড়িল পরেশের উপর। সে তখন মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

গুরুচরণ বাটী আসিয়া শুনিলেন, বাপের বাড়িতে কাহার কি নাকি একটা ভারী অসুখের সংবাদ পাইয়া মেজবৌ স্নানাহারের সময় পান নাই, গাড়ি ডাকাইয়া সেখানে চলিয়া গেছেন।

পঞ্চুর মা হাতমুখ ধোবার জল আনিয়া দিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, রাতও মিথ্যে, দিনও মিথ্যে বড়বাবু, তুমি আর কোথাও চলে যাও,—এ পাপের সংসারে বোধ হয় তোমার আর জায়গা হবে না।

ঢাক আসিল, ঢোল আসিল, কাঁসি আসিল, মামলায় জয়ী হওয়ার উপলক্ষে ও-বাড়িতে ৺শুভচণ্ডীর পূজার বাদ্যভাণ্ড-রবে সমস্ত গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল।

চার

দ্বিধা-বিভক্ত ভদ্রাসনের এক অংশ রহিল হরিচরণ ও অপর অংশে রহিলেন গুরুচরণ ও সংসারের বহুদিনের দাসী পঞ্চুর মা। পরদিন সকালে পঞ্চুর মা আসিয়া কহিল, রান্নার সমস্ত যোগাড় করে দিয়েছি, বড়বাবু।

রান্নার যোগাড়? ও—ঠিক,—চল যাচ্চি। এই বলিয়া গুরুচরণ উঠিবার উপক্রম করিতে দাসী কহিল, কিছু তাড়াতাড়ি নেই বড়বাবু, বেলা হোক না—আপনি বরঞ্চ আজ গঙ্গাস্নান করে আসুন।

আচ্ছা তাই যাই, বলিয়া গুরুচরণ নিমেষের মধ্যে গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কাজ বা কথার মধ্যে অসঙ্গতি কিছুই ছিল না, তবুও পঞ্চুর মার কেমন যেন ভারী খারাপ ঠেকিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ যেন সে বড়বাবু নয়।

পঞ্চুর মা বাড়ির ভিতরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, কখনো ভাল হবে না, কখনো না। শাস্তি ভগবান দেবেনই দেবেন।

কাহার ভাল হইবে না, কাহাকে তিনি শাস্তি দেবেনই দেবেন, ঠিক বুঝা গেল না, কিন্তু ছোটর তরফ হইতে এ লইয়া বিবাদ করিতে সেদিন কেহই উদ্যত হইল না।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

গুরুচরণের একমাত্র সন্তান বিমলচন্দ্র যে সুসন্তান নহে, পিতা তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। মাস-কয়েক পূর্বে ঘণ্টা-কয়েকের জন্য একবার সে বাড়ি আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই। সেবার একটা ব্যাগের মধ্যে সে গোপনে কি-কতকগুলা রাখিয়া যায়, চলিয়া গেলে গুরুচরণ পরেশকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন, দেখ ত বাবা, কি আছে ওর মধ্যে? পরেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছিল, কতকগুলো কাগজপত্র, বোধহয় দলিল-টলিল হবে। জ্যাঠামশাই, এগুলো পুড়িয়ে ফেলি।

গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, যদি দরকারী দলিল হয়?

পরেশ কহিয়াছিল, দরকারী ত বটেই, কিন্তু বিমলদার পক্ষে বোধ হয় অদরকারী। বিপদ কাজ কি ঘরে রেখে?

গুরুচরণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, না জেনে নষ্ট করা যায় না পরেশ, কারও সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। ওগুলো তুই কোথাও লুকিয়ে রেখে দি গে বাবা, পরে যা হয় করা যাবে।

এ ঘটনা আর তাঁর মনে ছিল না। আজ সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া রাঁধিতে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ সেই ব্যাগ হাতে পরেশ, হরিচরণ, গ্রামের জন-কয়েক ভদ্রব্যক্তি এবং পুলিশের দারোগা কনেস্টবলের দল আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই যে, বিমল ডাকাতির আসামী, সম্প্রতি ফেরার। খবরের কাগজে খবর পাইয়া পরেশ পুলিশের গোচর করিয়াছে। ব্যাগটা এতদিন তাহার কাছেই ছিল। বিমল মন্দ ছেলে, সে মদ খায়, আনুষঙ্গিক দোষও আছে, কলিকাতায় থাকিয়া কি একটা সামান্য চাকরি করিয়া সে এইসব করে। কিন্তু সে ডাকাতি করিতে পারে এ সংশয় পিতার মনের মধ্যে কখনো স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে পরেশের মুখের প্রতি গুরুচরণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে সেই নিষ্প্রভ অপলক দুই চক্ষের কোণ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; বলিলেন, সমস্তই সত্যি, পরেশ একটা কথাও মিছে বলেনি।

দারোগা আরও গোটা দুই-তিন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ছুটি দিল। যাবার সময় লোকটা হঠাৎ হেঁট হইয়া গুরুচরণের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, আপনি বয়সে বড়, ব্রাহ্মণ, আমার অপরাধ নেবেন না। এতবড় দুঃখের কাজ আমি আর কখনো করিনি।

আরো মাস-কয়েক পরে খবর আসিল, বিমলের সাত বৎসর জেল হইয়াছে।

পাঁচ

আবার ঢাক ঢোল ও কাঁসি সহযোগে ৺শুভচণ্ডীর সমারোহে পূজার আয়োজন হইতেছিল, পরেশ বাধা দিয়া কহিল, বাবা, এ-সব থাক।

কেন?

পরেশ কহিল, এ আমি সইতে পারবো না।

তাহার বাবা বলিলেন, বেশ ত, সইতে না পার, আজকের দিনটা কলকাতায় বেড়িয়ে এসো গে। জগন্মাতার পূজো—ধর্ম-কর্মে বাধা দিয়ো না।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা পড়িল না।

দিন-দশেক পরে একদিন সকালে গুরুচরণের ঘরের দিকে অকস্মাৎ একটা হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচির শব্দ উঠিল, খানিক পরে গয়লা-মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। হরিচরণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রক্ত কিসের মোক্ষদা, ব্যাপার কি?

কান্নার শব্দে বাটীর সকলে আসিয়াই পৌঁছিলেন। মোক্ষদা বলিল, দুধে জল দিয়েছি বলে বড়বাবু লাথি মেরে আমায় গর্তে ফেলে দিয়েছেন।

হরিচরণ কহিল, কে কে? দাদা? যাঃ—

পরেশ বলিল, জ্যাঠামশাই? মিথ্যে কথা।

ছোটগিন্নী বলিলেন, বঠ্‌ঠাকুর দিয়েছেন মেয়েমানুষের গায়ে হাত? তুই কি স্বপ্ন দেখচিস গয়লা-মেয়ে?

সে গায়ের কাদা-মাটি দেখাইয়া ঠাকুর-দেবতার দিব্য করিয়া বলিল, ঘটনা সত্য। ইনজংশনের কৃপায় প্রাচীর তোলা বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উঠানের গর্তগুলা তেমনিই ছিল,—বুজান হয় নাই। গুরুচরণ লাথি মারায় ইহারই মধ্যে মোক্ষদা পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে।

হরিচরণ কহিল, চল্ আমার সঙ্গে, নালিশ করে দিবি।

গৃহিণী কহিলেন, কি যে অসম্ভব বল তুমি! বঠ্‌ঠাকুর মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবেন কি! মিছে কথা।

পরেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটা কথাও বলিল না।

হরিচরণ কহিল, মিছে হয় ফেঁসে যাবে। কিন্তু দাদার মুখ দিয়ে ত আর মিথ্যে বার হবে না। মেরে থাকেন শাস্তি হবে।

যুক্তি শুনিয়া গৃহিণীর সুবুদ্ধি আসিল, কহিলেন, সে ঠিক। নিয়ে গিয়ে নালিশ করিয়েই দাও। ঠিক সাজা হয়ে যাবে। হইলও তাই। দাদার মুখ দিয়া মিথ্যা বাহির হইল না। আদালতের বিচারে তাঁহার দশ টাকা জরিমানা হইয়া গেল।

এবার ৺শুভচণ্ডীর পূজা হইল না বটে, কিন্তু পরদিন দেখা গেল কতকগুলা ছেলে দল পাকাইয়া গুরুচরণের পিছনে পিছনে হৈ হৈ করিয়া চলিয়াছে। গয়লানী মারার গানও একটা ইতিমধ্যে তৈরি হইয়া গিয়াছে।

ছয়

রাত্রি বোধ হয় তখন আটটা হইবে, হরিচরণের বৈঠকখানা গমগম করিতেছে, গ্রামের মুরুব্বিরা আজকাল এইখানেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অকস্মাৎ একজন আসিয়া বড় একটা মজার খবর দিল। কামারদের বাড়ির ছেলেরা বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে কলিকাতা হইতে জন-দুই খেমটা আনাইয়াছে, তাহারই নাচের মজলিসে বসিয়া গুরুচরণ।

হরিচরণ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, পাগল! পাগল! শোন কথা একবার! দাদা গেছে খেমটার নাচ দেখতে! কোন্ গুলির আড্ডা থেকে আসা হচ্চে অবিনাশ?

অবিনাশ মাইরি দিব্যি করিয়া বলিল, সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। একজন ছুটিয়া চলিয়া গেল, সঠিক সংবাদ আনিতে। মিনিট-দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, সে খবর সর্বাংশেই সত্য। আর শুধু নাচ দেখাই নয়, রুমালে বাঁধিয়া প্যালা দিতেও সে

এইমাত্র নিজের চোখে দেখিয়া আসিল। একটা হৈচৈ উঠিল। কেহ বলিল, এমন যে একদিন ঘটিবে তাহা জানা ছিল। কেহ কহিল, যেদিন বিনা দোষে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়াছে সেইদিনই সব বুঝা গেছে। একজন ছেলের ডাকাতির উল্লেখ করিয়া কহিল, ঐ থেকে বাপের চরিত্রও আন্দাজ করা যায়। এমন কত কি!

আজ কথা কহিল না শুধু হরিচরণ। সে অন্যমনস্কের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেমন যেন আজ ছেলেবেলার কথা মনে হইতে লাগিল, এ কি তাহার বড়দা! এ কি গুরুচরণ মজুমদার?

সাত

রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর, কিন্তু নাচ শেষ হইতে তখনও বিলম্ব আছে। বিশ্বকর্মার পূজা সকালেই শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহারই জের টানিয়া ভক্তের দল মদ খাইয়া, মাংস খাইয়া, খেমটা নাচাইয়া একটা দক্ষযজ্ঞের সমাপ্তি করিতেছে। অধিকাংশেরই কাণ্ডজ্ঞান বোধ হয় আর নেই, আর তাহারই মাঝখানে বসিয়া স্মিতমুখে বৃদ্ধ গুরুচরণ।

কে একজন চাদরে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পিঠের উপর হাত রাখিতেই তিনি চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, কে?

লোকটি কহিল, আমি পরেশ। জ্যাঠামশাই, বাড়ি চলুন।

গুরুচরণ দ্বিরুক্তি করিলেন না, বলিলেন, বাড়ি? চল।

উৎসব-মণ্ডের একটা ক্ষীণ আলোক রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল; সেইখানে আসিয়া পরেশ একদৃষ্টে গুরুচরণের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। চোখে সে জ্যোতি নাই, মুখে সে তেজ নাই, সমস্ত মানুষটাই যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায়। এতদিন পরে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং এতদিন পরে আজ তাহার চোখে ঠেকিল, লোকের কাছে

জ্যাঠামশায়ের জন্য লজ্জা পাইবার আর কিছু নাই। এই অর্ধ-সচেতন দেহ ছাড়িয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেছেন। কহিল, আপনার কাশী যাবার বড় ইচ্ছে জ্যাঠামশাই, যাবেন?

গুরুচরণ কাঙ্গালের মত বলিয়া উঠিলেন, যাবো পরেশ যাবো, কিন্তু কে আমাকে নিয়ে যাবে?

পরেশ কহিল, আমি নিয়ে যাবো জ্যাঠামশাই।

তবে চল একবার বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসি গে।

পরেশ কহিল, না জ্যাঠামশাই, ও-বাড়িতে আর না। ওর কিছু আমরা চাইনে।

গুরুচরণের হঠাৎ যেন হুঁশ হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, কিচ্ছু চাইনে? ও-বাড়ির আমরা কিচ্ছুটি চাইনে?

পরেশ চোখ মুছিয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই, কিচ্ছুটি চাইনে। ও-সব নেবার অনেক লোক আছে,—চলুন।

চল, কহিয়া গুরুচরণ পরেশের হাত ধরিলেন, এবং জনহীন অন্ধকার পথ ধরিয়া উভয়ে রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন।